১০.৯ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা
The World Health Organization [WHO]

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম হল বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization : WHO)। ১৯৪৫ সালে 'সানফ্রানসিস্কো সম্মেলনে একটি বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা গঠনের ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ওই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের জুন-জুলাই মাসে একটি বিশ্বস্বাস্থ্য সম্মেলনে (International Health Conference) আহ্বান করা হয়। উক্ত সম্মেলনে ২২ জুলাই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংবিধান স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর সাধারণসভা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে স্বীকৃতি জানায় এবং ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে ৬৪টি দেশের প্রতিনিধিবর্গ দ্বারা এই সংস্থা গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওই বছর ৭ এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে এই সংস্থার জন্মলাভ হয়। তখন থেকেই ৭ এপ্রিল আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য দিবস হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। ১৯৪৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই সংস্থার কাজ শুরু হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো : একটি বিশ্বস্বাস্থ্য সভা (World Health Assembly), একটি কার্যনির্বাহী পর্ষদ (Executive Board), একটি সচিবালয় এবং ৬টি আঞ্চলিক কমিটি (Regional Committee) নিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামোটি গঠিত। বিশ্বস্বাস্থ্য সভা সংস্থার সকল সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়। বছরে একবার এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সংস্থার কার্যাবলি পর্যালোচনা করা হয়, নীতি নির্ধারণ ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয় এবং বাজেট অনুমোদন করা হয়। **কার্যনির্বাহী পর্ষদ** গঠিত হয় বিশ্বস্বাস্থ্য সভা কর্তৃক নির্বাচিত ৩১জন সদস্যকে নিয়ে। কার্যনির্বাহী পর্ষদের প্রধান হলেন মহাপরিচালক (Director General)। তিনিই এই সংস্থার প্রশাসনিক প্রধান।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার **সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভা** শহরে অবস্থিত। আর ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয় আছে যেগুলি ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকার যে অংশ সাহারা মরুভূমির দক্ষিণে অবস্থিত, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অবস্থিত। ইংরেজি, আরবি, চৈনিক, রুশ, ফরাসি এবং স্প্যানিশ ভাষায় এই সংস্থার কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। বর্তমানে এর সদস্যসংখ্যা ১৯৪।

কার্যাবলি বা ভূমিকা : বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হল বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য সুনিশ্চিত করা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই সংস্থা নিম্নলিখিত কার্যাবলি সম্পাদন করে ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ; জনসাধারণকে স্বাস্থ্যের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য বিভিন্ন দেশে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা ; সুস্বাস্থ্য সংরক্ষণের স্বার্থে খাদ্যের উৎপাদন ও যোগান অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করা ; জল ও তার তার নিষ্কাশন ব্যবস্থাকে নিরাপদ করা ; বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করা ; ওষুধপত্রের মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ; স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণার জন্য সহায়তা করা ; পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা ; মা ও শিশুর স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করা ; ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, ডিপথেরিয়া, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা জাতিপুঞ্জের **শিশু তহবিলের** (UNICEF) সঙ্গে একযোগে শিশুদের মধ্যে হাম, ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, টিটেনাস প্রভৃতি প্রতিরোধের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কুষ্ঠরোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে এবং ম্যালেরিয়া ও বসন্তরোগ নির্মূলীকরণে সংস্থা বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে স্বাস্থ্যবিষয়ক আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করেছে। আন্তর্জাতিক স্তরে জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও বিকাশসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কাজটি এই সংস্থা সম্পন্ন করে থাকে। গ্রিসদেশে ম্যালেরিয়া এবং ভারতবর্ষে যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধে এই সংস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৬০ সালে মরক্কোয় খনিজ তেল মিশ্রিত ভোজ্যতেল ব্যবহার করে বহু মানুষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়লে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার মোকাবিলায় প্রশংসনীয় ভূমিকা নেয়। ওই বছরেই আগাদির অঞ্চলে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত মানবগোষ্ঠীর পাশে এসে দাঁড়ায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা। বস্তুতপক্ষে জাতিপুঞ্জের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থাসমূহের মধ্যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হল অন্যতম সফল সংস্থা।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এতদ্‌সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি এখন চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হতে দেখা যাচ্ছে। এখনও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ নানা প্রকার রোগে ভুগে অকালে প্রাণ দিচ্ছে। এখনও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে, রোগ-জীবাণু সম্পর্কে চেতনা যথেষ্ট কম। তৃতীয় বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র এবং নিরক্ষর। তারা দুবেলা দুমুঠো খেতে পায় না ; তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করতে বাধ্য হয়। তারা না পারে রোগের চিকিৎসা করাতে, না পারে ওষুধ কিনতে। তার ওপর রয়েছে বহুজাতিক কোম্পানিগুলির মুনাফা অর্জনের লোভ। বেশিরভাগ জীবনদায়ী ও বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ওপর এইসব কোম্পানির একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম রয়েছে। ফলে ওষুধপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠছে এবং রোগের চিকিৎসা সাধারণ মানুষের সাধ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এ বিষয়ে কোনো কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে ব্যর্থতা তার জন্য দায়ী আর্থিক অস্বাচ্ছল্যতা। স্বাস্থ্যের সংকট একটি বিশ্বজোড়া সংকট। এই সংকটের মোকাবিলা করতে হলে এবং এই সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করতে হলে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কোনো নিজস্ব তহবিল নেই। সদস্য-রাষ্ট্রগুলির আর্থিক সাহায্যের ভিত্তিতে এই সংস্থাকে তার কাজকর্ম পরিচালনা করতে হয়। তাই বিশ্বের মানুষকে নিরোগ ও স্বাস্থ্যবান করার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না।

১০.১০ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO):*

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে বিশ্ববাসীর সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়ন ও বিকাশের যে লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তার বাস্তবায়নের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা (ইউনেস্কো) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালের নভেম্বরে লন্ডনে যে আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে জাতিপুঞ্জের অধীনে এই ধরনের একটি সংস্থা গঠনের পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং এই উদ্দেশ্যে একটি খসড়া সংবিধানও রচনা করা হয়। ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিপুঞ্জের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক সংস্থারূপে ইউনেস্কোর আনুষ্ঠানিক জন্মলাভ হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো : তিনটি সংস্থাকে নিয়ে ইউনেস্কোর সাংগঠনিক কাঠামোটি গড়ে উঠেছে—(১) সাধারণ সম্মেলন (General Conference), (২) কার্যনির্বাহী পর্ষদ (Executive Board), এবং (৩) সচিবালয় (Secretariat)।

সাধারণ সম্মেলন : সাধারণ সম্মেলন হল ইউনেস্কোর পরিচালন সমিতি। এই সাধারণ সম্মেলন গঠিত হয় সংস্থার সকল সদস্যরাষ্ট্রকে নিয়ে। প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র ৫ জন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে, তবে ভোট দিতে পারে কেবল ১ জনই। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা হল ১৯৩। মনে রাখতে হবে ইউনেস্কোর সমস্ত সদস্যই জাতিপুঞ্জের সদস্য নয়, যেমন কুক দ্বীপপুঞ্জ, নিউ (Niue), প্যালেস্টাইন ইত্যাদি। আবার জাতিপুঞ্জের কিছু সদস্য রয়েছে যারা ইউনেস্কোর সদস্য নয়, যেমন ইজরায়েল, লিচেনস্টাইন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইজরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৮ সালে বিশেষ কারণে ইউনেস্কোর সদস্যপদ ত্যাগ করে। বছরে একবার এর অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তবে কার্যনির্বাহী পর্ষদ এর বিশেষ অধিবেশন ডাকার ব্যবস্থা করতে পারে। সাধারণ সম্মেলন এই সংস্থার কর্মসূচি নির্ধারণ করে এবং বাজেট প্রণয়ন করে। সদস্য-রাষ্ট্রগুলি এই সংস্থার নিকট যেসব প্রতিবেদন পাঠায়, সাধারণ সম্মেলনে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। সাধারণ সম্মেলনে কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হন। শিক্ষা, বিজ্ঞান, মানবিক বিষয় এবং জ্ঞানের প্রসারের জন্য সাধারণ সম্মেলন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

কার্যনির্বাহী পর্ষদ : সাধারণ সম্মেলনে যেসব কর্মসূচি প্রণীত হয় সেগুলি বাস্তবায়নের দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পর্ষদের। এই পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হল ২৪। শিক্ষা, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি বিষয়ে যোগ্যতা ও অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এই পর্ষদের সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। এছাড়া পর্ষদ গঠনের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্ব

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের দিকে নজর দেওয়া হয়। কার্যনির্বাহী পর্ষদের সদস্যগণ সাধারণ সম্মেলন কর্তৃক ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

সচিবালয় : একজন মহাপরিচালক এবং অন্যান্য কর্মচারীদের দিয়ে সচিবালয় গঠিত। কার্যনির্বাহী পর্ষদের সুপারিশক্রমে মহাপরিচালক ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং তিনি সচিবালয়ের কর্মচারীদের নিয়োগ করেন। ইউনেস্কোর কর্মসূচিকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব সচিবালয়কেই পালন করতে হয়। এছাড়া সচিবালয়ের কাজ হল কার্যনির্বাহী পর্ষদকে সাহায্য করা। ইউনেস্কোর **সদর দপ্তর প্যারিসে** অবস্থিত।

কার্যাবলি : সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান উদ্দেশ্য হল পৃথিবী থেকে যুদ্ধের অবসান এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা। যুদ্ধ বাধে মানুষের জন্যে, আবার মানুষের দ্বারাই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মানুষ পরিচালিত হয় মনের দ্বারা। সুতরাং এই মনটাকে যদি নির্মল ও শান্তিময় করে তোলা যায় তাহলে যুদ্ধের অভিশাপ থেকে মানুষ মুক্তি পায়। ইউনেস্কোর সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, "যুদ্ধের শুরু যেহেতু মানুষের মনে, সেহেতু মানুষের মনেই গড়ে তুলতে হবে শান্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা" ("Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that defences of peace must be constructed.")। মনের বিকাশ ঘটাতে হলে প্রয়োজন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশসাধন ; আর এই উদ্দেশ্য নিয়েই গঠিত হয়েছে ইউনেস্কো নামক জাতিপুঞ্জের বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক এই সংস্থাটি। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো, নিরক্ষরতা দূর করা এবং সর্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ন্যায়নীতি, মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা প্রভৃতির বিকাশসাধনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার প্রসার ঘটানো ইত্যাদি হল ইউনেস্কোর মূল উদ্দেশ্য।

শিক্ষার প্রসারে ইউনেস্কোর ভূমিকা : ইউনেস্কো মানবজাতির উন্নয়নে শিক্ষার প্রসারে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষা হল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রধান মাধ্যম। এই বিষয়টি মাথায় রেখে ইউনেস্কো শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের জন্য বিভিন্ন দেশকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গবেষণা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুলেছে, পাঠাগার গড়ে তুলেছে, ঐতিহাসিক নিদর্শন পুনরুদ্ধারের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে, পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইউনেস্কো ১৯৬৫ সালে 'কেন্দ্রীয় জনশিক্ষা পরিকল্পনা' (Pilot Mass Literacy Project) গ্রহণ করেছে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে প্যারিসে International Institute of Educational Planning নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। ১৯৫১ সালে মেক্সিকোতে একটি 'মৌল শিক্ষাকেন্দ্র' গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া ইউনেস্কো বহু দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তারে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে, বহু দেশকে বিনামূল্যে পুস্তক সরবরাহ করেছে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশে ইউনেস্কোর ভূমিকা : প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশে ইউনেস্কো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। গণিত, পদার্থবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, সামুদ্রিক বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার প্রসারে এই সংস্থা প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণের প্রসারে ইউনেস্কো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ইউনেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৬৫ সালে জলসম্পদ প্রসঙ্গে গবেষণামূলক অনুসন্ধানের জন্য পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভারত মহাসাগর অভিযান অনুষ্ঠিত হয়।

সংস্কৃতির বিকাশে ইউনেস্কোর ভূমিকা : মানবজাতির সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংরক্ষণে এবং সৃজনশীল চারুকলার বিকাশে ইউনেস্কো অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সঙ্গীত, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতির উন্নতি সাধনে, পৃথিবীর বহু অংশে ঐতিহ্যবাহী স্মারক স্থান ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক নিদর্শন সংরক্ষণে ইউনেস্কোর ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসনীয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সাংস্কৃতিক ব্যবধান মোচনের ব্যাপারে ইউনেস্কো ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে ভূমিকা : গণ-সংযোগ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে, আন্তর্জাতিক তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সংবাদমাধ্যম সমূহের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নতুন সংবাদ সংস্থা গঠনের ক্ষেত্রে—ইত্যাদি নানা ব্যাপারে ইউনেস্কো কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সমালোচনা : সমালোচকেরা ইউনেস্কোর কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছেন।

(১) ইউনেস্কো গঠিত হয়েছে সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে। তাই সমালোচকদের মতে এই সংস্থাটি যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।

(২) বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানোর ব্যাপারে সঠিক নীতি নির্ধারণের বিষয়টি খুবই জরুরি। সমালোচকদের মতে, ইউনেস্কোর সংগঠকরা এই জায়গাটিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

(৩) নিজস্ব অর্থভাণ্ডার না থাকাটাও সংস্থার সাফল্যের পক্ষে একটা বড়ো অন্তরায়। মানবজাতির কল্যাণে ইউনেস্কো যেসব কর্মসূচি বা পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। নিজস্ব অর্থভাণ্ডার না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই সংস্থাকে সদস্য-রাষ্ট্রসমূহের আর্থিক অনুদানের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়।

(৪) ইউনেস্কোর মহান লক্ষ্যগুলিকে কার্যকর করতে গেলে প্রয়োজন ধনী-দরিদ্র, উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের আন্তরিক সহযোগিতা। সেই ধরনের অনুকূল পরিবেশ এই সংস্থাটি পায়নি। দীর্ঘ চার দশকের বেশি সময় ধরে এই সংস্থাটিকে কাজ করতে হয়েছে ঠান্ডাযুদ্ধের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে।

বর্তমানে ঠান্ডাযুদ্ধের অবসান হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পরিস্থিতি এখনও অনুকূল নয়। যে পশ্চিমি শক্তিজোট গোড়ার দিকে ইউনেস্কোকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল, ৭০-এর দশক থেকে সেই শক্তিজোট এর ঘোরতর বিরোধিতা শুরু করে দেয়। যখন থেকে জাতিপুঞ্জের ওপর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রভাব বাড়তে শুরু করল, তখন থেকেই ইউনেস্কো সম্বন্ধে পশ্চিমি জোটের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। ইউনেস্কোর ওপর তার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব কায়েম করতে না পেরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এই সংস্থা থেকে সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৮৫ সালে ব্রিটেন ও সিঙ্গাপুর সদস্যপদ ত্যাগ করে। স্বাভাবিকভাবেই ইউনেস্কো চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন এই সংস্থার মোট ব্যয়ের যথাক্রমে ২৫% এবং 5% বহন করত। এই অবস্থায় ইউনেস্কোর কল্যাণমুখী কাজ যে অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

১০.১৩ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
International Labour Organisation (ILO)

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধক সংস্থা হল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির অধীনে, অর্থাৎ জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার অনেক আগেই। জাতিপুঞ্জের সঙ্গে এই সংস্থার সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৯৪৬ সালে কানাডার মনট্রিলে সম্পাদিত একটি চুক্তির মাধ্যমে। জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা চুক্তির শর্তাদি অনুমোদন করে ১৯৪৯ সালের ১৪ ডিসেম্বর। বর্তমানে এই সংস্থার সদস্য সংখ্যা হল ১৮৭।

জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়েও ILO-র সদস্য নয় এমন কয়েকটি রাষ্ট্র হল ভুটান, আন্ডোরা, মোনাকো, লিচ্‌টেনস্টাইন, নউরু, মাইক্রোনেশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

গঠন কাঠামো : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তিনটি প্রধান অঙ্গ রয়েছে, যথা—(১) **সাধারণ সম্মেলন** (General Conference), (২) **পরিচালক সংস্থা** (Governing body) এবং (৩) **আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর** (International Labour Office)। সাধারণ সম্মেলন হল ILO-র নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নকারী অঙ্গ। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের ৪ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে সাধারণ সম্মেলন গঠিত হয়। এই চারজনের মধ্যে ২ জন হল সরকারের প্রতিনিধি, একজন শ্রমিক প্রতিনিধি এবং একজন মালিক প্রতিনিধি। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে। **পরিচালক সংস্থা** হল ILO-র কার্যনির্বাহী বা শাসন বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ। মোট ৫৬ জন প্রতিনিধি নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। এই ৫৬ জনের মধ্যে ২৮ জন হলেন সরকারি প্রতিনিধি, ১৪ জন শ্রমিক প্রতিনিধি এবং বাকি ১৪ জন মালিক প্রতিনিধি। সংস্থার আলোচ্যসূচি নির্ধারণ, শ্রম দপ্তরের কাজকর্মের তদারকি, আয়-ব্যয় নির্ধারণ প্রভৃতি হল পরিচালক সংস্থার প্রধান কাজ। পরিচালক সংস্থা যে বাজেট প্রস্তুত করে, তা সাধারণ সম্মেলনে পেশ করা হয়। **আন্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর** হল আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সচিবালয়। এর সদর দপ্তরটি সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে অবস্থিত। শ্রম দপ্তরের প্রধান হলেন একজন **মহাপরিচালক** (Director General)। কোনো দেশের সরকার অথবা শ্রমিক বা মালিক পক্ষ থেকে কোনো পরামর্শ চাওয়া হলে আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তর সংশ্লিষ্ট পক্ষকে পরামর্শ ও সাহায্য করে।

উদ্দেশ্য : আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার **প্রধান উদ্দেশ্য** হল দুনিয়ার শ্রমজীবী জনতার কল্যাণ সাধনের স্বার্থে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণ করা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া বিশ্বের মেহনতী মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা এবং শ্রমিকদের কাজের পরিবেশকে সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত করে তোলা হল এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

কার্যাবলি : (১) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার **প্রধান কাজ** হল বিশ্বের সমস্ত শ্রেণির শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি এবং কল্যাণসাধন করা। এই উদ্দেশ্যে সংস্থাকে বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয় এবং সেগুলি কার্যকর করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হয়। বিষয়গুলি হল : পূর্ণ কর্মসংস্থান, শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান, উন্নত জীবনযাত্রার উপযোগী মজুরির ব্যবস্থা, শ্রমের জন্য সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, অসুস্থ ও আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক-বালিকাদের শ্রমসাধ্য কাজে নিয়োগ রোধ করা, শ্রমিক সংক্রান্ত যাবতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্যাদি সংগ্রহ ও সুরক্ষিত করা, (২) শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে গবেষণা, পরামর্শদান এবং প্রয়োজনে কারিগরি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, (৩) যোগ্যতার ভিত্তিতে সঠিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, (৪) শ্রমিক কল্যাণে ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুমোদন, (৫) অনুমোদিত চুক্তিগুলির বাস্তবায়ন করা ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রণীত বাধ্যতামূলক কোনো কনভেনশন অথবা সদস্য রাষ্ট্রগুলি কর্তৃক অনুমোদিত কোনো শ্রমনীতি কোনো রাষ্ট্র উপেক্ষা করতে পারে না। উপেক্ষা করা হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মালিক সংগঠন বা শ্রমিক সংগঠন পরিচালক সংস্থার কাছে প্রতিবেদন পাঠাতে পারে বা অভিযোগ দায়ের করতে পারে। শ্রমসংস্থা অভিযুক্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তদন্তের ব্যবস্থা করতে পারে বা প্রয়োজন মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

সমালোচনা : বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে গঠিত হলেও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা শোনা যায়। **প্রথমত,** ভারতের মতো উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রচ্ছন্নভাবে বেগার শ্রম (bonded labour) ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে। অভাবের তাড়নায় গরিব মানুষকে ঋণ করতে হয়। আর সময়মতো ঋণ পরিশোধ করতে না পারায় তাদেরকে এমনকি তাদের বংশধরদের বংশপরম্পরায় ঋণের জালে আবদ্ধ থাকতে হয়। বিনা পারিশ্রমিকে তাদের শ্রমদান করতে হয়। এইভাবে ঋণের দায়ে দাসত্ব প্রথা আজও অব্যাহত রয়েছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে খুব একটা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

দ্বিতীয়ত, তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের গরিব মানুষের নাবালক সন্তানদের শ্রমনিবিড় বহু কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে হয়। এ ব্যাপারেও শ্রম সংস্থার ভূমিকা মোটেই আশাপ্রদ নয়।

তৃতীয়ত, শুধু তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশগুলির নয়, পশ্চিমের ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শ্রমিকের ক্ষেত্রেও শ্রমসংস্থা তার উপযুক্ত দায়িত্ব পালনের নজির রাখতে পারেনি। ১৯৯২ সালে গ্রেট ব্রিটেনের কয়লা খনিগুলিতে নিযুক্ত শ্রমিকদের ওপর মালিক শ্রেণি অমানুষিক অত্যাচার চালাত। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শ্রমিক স্বার্থ রক্ষায় কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

ব্যর্থতার পাল্লা ভারী হলেও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা একেবারেই ব্যর্থ একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। গত শতকের নব্বইয়ের দশকে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের শ্রমিক অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা তাদের কষ্ট লাঘবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। প্রতি বছর ILO বহু আন্তর্জাতিক কনভেনশন প্রণয়ন করে। উদাহরণস্বরূপ, শুধু ২০১১ সালেই ILO ১৮৯টি কনভেনশন প্রণয়ন করে। এই কনভেনশনগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত বলে তাদের মেনে চলা সদস্যরাষ্ট্রগুলির অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণের ক্ষেত্রে ILO-র ভূমিকা অসাধারণ। ১৯৯২ সালে ILO-র উদ্যোগে শিশু শ্রম নিবারণে একটি প্রকল্প গড়ে তোলা হয়, যার নাম International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC)। এই প্রকল্পের ভূমিকা যথেষ্ট সন্তোষজনক।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বেগার শ্রমিক (Forced Labour) বন্ধের ক্ষেত্রেও ILO অনবদ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে গত শতকের ৬০-এর দশক থেকে। ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL) নামে একটি কর্মসূচি প্রণয়ন করে।

শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শ্রম সংস্থা 'ন্যূনতম মজুরি আইন' (Minimum Wage Law) নির্ধারণ করেছে।

উপসংহার : সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, নিরলস এবং প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

GE4T : United Nations and Global Conflicts

4th Semester GE

Kamal Sarkar

Unit – I. The United Nations.

(c) The specialised agencies ILO, UNESCO, WHO,

Quest. → সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিশেষ বিশেষ সংস্থার (ILO, UNESCO, WHO) সম্পর্কে আলোচনা কর ?

⇒ প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পর ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়েছিল 'লিগ অব নেশনস'। আধুনিক বিশ্বে 'লিগ অফ নেশনস' ছিল প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রগুলির বিরোধ নিষ্পত্তির নিশ্চিত ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বৃহৎ শক্তির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে লিগের অবলুপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে, এই ভয়াবহ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয় ১৯৪৫ সালের আগস্টে। যদিও যুদ্ধ চলাকালীন নতুন একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুতি চলে জোর কদমে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডন ঘোষণা এবং আটলান্টিক সনদের ঘোষণা পত্র এর সূচনা হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে ৫০ টি দেশের প্রতিনিধিদের সর্বসম্মত সমর্থন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। ১৯ টি অধ্যায় এবং ১১১ টি অনুচ্ছেদ নিয়ে জাতিপুঞ্জের সনদ রচিত হয়।

বিশেষায়িত এজেন্সিগুলি তাদের নিজস্ব নীতি, সদস্য-পদ, অঙ্গ এবং আর্থিক সংস্থান নিয়ে আইনত স্বাধীন আন্তর্জাতিক সংস্থা, আলোচ্য চুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। কয়েকটি এজেন্সি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিদ্যমান ছিল, কিছু সাথে লিগ অব নেশনসের সাথে যুক্ত ছিল, অন্যগুলি প্রায় একই সাথে জাতিসংঘের সাথে তৈরি হয়েছিল এবং কয়েকটি ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাতে নিজেই জাতিসংঘ দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল।

Reference – রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত — দেবব্রত মিত্র

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক – তত্ত্ব এবং সমকালীন বিষয় → প্রণব কুমার মালাকার

Scanned with CamScanner